Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-II, published on April 2023, Page No. 96 – 101
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোটগল্পে দুর্ভিক্ষের প্রসঙ্গ

সুতনু দাস
গবেষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল : sutanudas1710@gmail.com

Keyword
পঞ্চাশের মন্বন্তর, বোট ডিনায়েল পলিসি, রাইস ডিনায়েল পলিসি, দুর্ভিক্ষ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

Abstract
১৩৫০ বঙ্গাব্দে (১৯৪৩ খ্রীঃ) অবিভক্ত বাংলায় যে দুর্ভিক্ষ দেখা যায় তা পঞ্চাশের মন্বন্তর নামে পরিচিত। কেবল জাপানের হাতে রেঙ্গুন পতনই নই; ১৯৪২-৪৩ এ বাংলার বেশ কিছু অঞ্চলে বন্যা এবং যুদ্ধকালীন সময়ে ব্রিটিশ সরকারের 'বোট ডিনায়েল পলিসি' এবং 'রাইস ডিনায়েল পলিসি' মন্বন্তরের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। পঞ্চাশের এই মন্বন্তরে ক্ষুধার তাড়নায় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ে দুর্ভিক্ষ। সামান্য কিছু খাদ্যের আশায় গ্রামের বুভুক্ষু মানুষেরা কলকাতা শহরের পথে ধাবিত হয়। গ্রাম থেকে আগত বুভুক্ষু মানুষগুলির জন্য কলকাতা শহরে বেশ কিছু লঙ্গরখানা খোলা হলেও এত মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় রিলিফ দেওয়া সম্ভব হয়নি। ফলে শহরের যত্রতত্র অনাহারে থাকা মানুষের লাশে ভরে উঠেছিল। পঞ্চাশের মন্বন্তরের এই ভয়াবহতা সমকালীন শিল্প–সাহিত্যকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-৫৬) তাঁর সাহিত্য জীবনের দ্বিতীয় পর্বে দুর্ভিক্ষের এই ভয়াবহতা এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য মানুষের সংগ্রামকে প্রত্যক্ষ করেন এবং তাকে সাহিত্যে রূপ দান দেন। এই পর্বে তাঁর রচিত 'আজ কাল পরশুর গল্প', 'দুঃশাসনীয়', 'নমুনা', 'গোপাল শাসমল', 'তারপর?', 'সাড়ে সাত সের চাল', 'প্রাণ', 'মাসীপিসি', 'পেট ব্যাথা' প্রভৃতি গল্পে দুর্ভিক্ষ কালীন গ্রাম বাংলার দুরাবস্থা ছবি ফুটে উঠেছে।

Discussion
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালীন সময়ে অবিভক্ত বাংলায় ১৩৫০ বঙ্গাব্দে (১৯৪৩ খ্রীঃ) যে দুর্ভিক্ষ দেখা যায় তা পঞ্চাশের মন্বন্তর নামে পরিচিত। ১৯৪২ সালের ১০ই মার্চ জাপানের হাতে রেঙ্গুনের পতনের ফলে সেখান থেকে ভারতে চালের আমদানি বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু গোটা বাংলায় দুর্ভিক্ষের কারণ হিসেবে কেবল রেঙ্গুনের পতনই দায়ী নয়। ১৯৪২-৪৩ সালে মেদিনীপুর, বর্ধমান সহ বাংলার বেশ কিছু অঞ্চলে বন্যার ফলে অনেক কৃষিজ ফসল নষ্ট হয়। তাছাড়া যুদ্ধকালীন সময়ে ব্রিটিশ সরকার 'বোট ডিনায়েল পলিসি' এবং 'রাইস ডিনায়েল পলিসি' নামক দুটি আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করে বাংলাকে দুর্ভিক্ষের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ১৯৪২ সালে জাপানী সৈন্যদের আক্রমণের সম্ভাবনার কথা ভেবে ব্রিটিশ সরকার 'বোট ডিনায়েল পলিসি' লাঘু করেন। এই নীতিতে ব্রিটিশ সরকার উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলি থেকে দশজনের অধিক বহন

যোগ্য সকল নৌযান বাজেয়াপ্ত করে। ফলে মানুষের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। 'রাইস ডিনায়েল পলিসি' র মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ সরকার বাংলার উপকূলবর্তী অঞ্চল থেকে চাল সরিয়ে নেয়। ফলের যুদ্ধের বাজারে চালের দর হঠাৎ করে দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায়। এর পাশাপাশি মজুতদাররা অধিক অর্থলাভের আশায় বাজার থেকে শস্য তুলে তাকে গুদামজাত করে কৃত্রিমভাবে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দেয়।

এর ফলে ক্ষুধার তাড়নায় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ে দুর্ভিক্ষ। সামান্য কিছু খাদ্যের আশায় গ্রামের বুভুক্ষু মানুষেরা কলকাতা শহরের পথে ধাবিত হয়। গ্রাম থেকে আগত বুভুক্ষু মানুষগুলির জন্য কলকাতা শহরে বেশ কিছু লঙ্গরখানা খোলা হলেও এত মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় রিলিফ দেওয়া সম্ভব হয়নি। ফলে শহরের যত্রতত্র অনাহারে থাকা মানুষের লাশে ভরে উঠেছিল। পঞ্চাশের এই দুর্ভিক্ষে Famine Inquiry Commission, India (1945) –এর রিপোর্ট অনুযায়ী প্রায় ১৫লক্ষের কাছাকাছি মানুষ মারা যায়। যদিও মনে করা হয় আসল সংখ্যা ছিল তারও অধিক।

পঞ্চাশের মন্বন্তরের এই ভয়াবহতা সমকালীন শিল্প–সাহিত্যকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-৫৬) তাঁর সাহিত্য জীবনের দ্বিতীয় পর্বে দুর্ভিক্ষের এই ভয়াবহতা এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য মানুষের সংগ্রামকে প্রত্যক্ষ করেন এবং তাকে সাহিত্যে রূপ দান দেন। ১৯৪৪এ মার্ক্সীয় দর্শনে দীক্ষা নেওয়ার পর তাঁর সাহিত্যে প্রাত্যহিক জীবনে মানুষের বেঁচে থাকবার সংগ্রাম এক বিশেষ মাত্রা যোগ করেছে। এ প্রসঙ্গে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন –

> "এই পর্বে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে, ব্যক্তি ও সমাজ সম্পর্কে, শিল্পবোধ ও সাহিত্য সম্পর্কে লেখকের ধারণা এক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গিয়েছে।সুস্থ জীবনবোধ ও বেঁচে থাকার লড়াইয়েরপ্রতি শ্রদ্ধার মূলে আছে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের পরিবর্তন।"[১]

এই পর্বে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'আজ কাল পরশুর গল্প' (জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩) গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'আজ কাল পরশুর গল্প', 'দুঃশাসনীয়', 'নমুনা', 'গোপাল শাসমল', 'তারপর?' প্রভৃতি এবং 'পরিস্থিতি' (আশ্বিন ১৩৫৩) গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'সাড়ে সাত সের চাল', 'প্রাণ', 'মাসীপিসি', 'পেট ব্যাথা' প্রভৃতি গল্পে দুর্ভিক্ষ কালীন গ্রাম বাংলার দুরাবস্থা ছবি ফুটে উঠেছে।

'আজ কাল পরশুর গল্প' তে মন্বন্তরকালীন দুর্ভিক্ষ কবলিত গ্রামগুলিতে ক্ষুধার তাড়নায় গ্রাম বাংলার চিরাচরিত অন্ধসংস্কারকে বিসর্জন দিয়ে কীভাবে বেঁচে থাকাই একমাত্র কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় মানুষের– তারই এক বাস্তব ছবি ধরা পড়েছে। মানসুকিয়ার চাষী রামপদ দুর্ভিক্ষ মহামারীর সময় স্ত্রী মুক্তা ও সাত মাসের শিশু খোকনকে গ্রামে রেখে রোজগারের আশায় শহরে পাড়ি দেয়। সারা গ্রামবাংলায় তখন প্রবল অন্নসংকট। সেই অন্নসংকটের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পায়নি রামপদর পরিবারও। অনাহারে শিশুর মৃত্যুর পর রামপদর স্ত্রী মুক্তা বেঁচে থাকার তাগিদে দিশাহীন হয়ে শহরে চলে যায়। সেখানে সে পেটের দায়ে দেহ বিক্রিতে বাধ্য হয়। এগারো মাস পর শহরের এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মুক্তাকে উদ্ধার করে গ্রামে রামপদর কাছে নিয়ে আসে। মুক্তা ফিরে এলেও তৎকালীন সময়ে গ্রামের অনেক মেয়েই এই অন্ধকার জগৎ থেকে মুক্তি পায়নি। গল্পের আরেক চরিত্র বনমালীর স্ত্রী সেই মেয়েদেরই দলে।

গ্রামের একদিকে ছিল রামপদ, বনমালীর মতো মানুষেরা, যাদের পরিবার দুর্ভিক্ষ, মহামারীতে ভেসে গিয়েছে। আবার গ্রামের অপর প্রান্তে সমাজপতি ঘনশ্যামদাসের মতো মানুষেরও বসবাস। যে নিজের প্রভুত্ব বজায় রাখবার জন্য দলবল নিয়ে রামপদকে শাসিয়ে দিয়ে যায়, যাতে রামপদ স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে। ঘনশ্যাম রামপদর ওপর এ ধরণের শমন জারি না করলে মুক্তাকে নিয়ে মানসুকিয়ার চাষাভুসোদের জীবনে দুর্ভিক্ষকালীন সময়ে তেমন কোনো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হত না।কারণ –

> "প্রায় সকলেই আহত, উৎপীড়িত, সমাজ-পরিত্যক্ত অসহায়ের মতো। মনগুলি ভাঙা, দেহগুলিও। আজ কী করে বাঁচা যায় আর কাল কী হবে এই চেষ্টা আর ভাবনা নিয়ে এমন ব্যস্ত আর বিব্রত সবাই যে জোট বেঁধে ঘোট পাকাবার অবসর আর তাগিদ যেন জীবন থেকে মুছে গেছে। সকলকে উত্তেজিত করতে গিয়ে এই

সত্যতা বেরিয়ে আসে। রামপদর কাণ্ডের কথাটা হুঁ হাঁ দিয়ে সেরে দিয়েই সবাই আলোচনা করতে চায় ধান, চাল, নুন, কাপড়ের কথা, যুদ্ধের কথা। পেতে চায় বিশেষ অনুগ্রহ, সামান্য সুবিধা ও সুব্যবস্থা।"[২]

শহরে গিয়ে মুক্তার জাত গিয়েছে – এই বিষয়কে কেন্দ্র করে ঘনশ্যাম কর্তৃক আয়োজিত বিচার সভায় গ্রামের সাধারণ মানুষজন মুক্তার শহরে চলে যাওয়ার মধ্যে কোনো দোষ খুঁজে পায়না। বিচার সভায় উপস্থিত করালী বলে, "গাঁয়ে খেতে পায়নি, সোয়ামি কাছে নেই, তাই সদরে খেটে খেতে গেছে। ওর দোষটা কীসের?"[৩] আবার কেউ আড়াল থেকে বলে, "সে-বেলা তো কেউ আসেনি, দুটি খেতে-পরতে দিতে?"[৪] এই ভাবে সাধারণ মানুষদের সমবেত প্রতিবাদে বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে বিচারসভার পরিসমাপ্তি ঘটে। আসলে এই দুর্ভিক্ষের দিনে গ্রামের অভুক্ত মানুষদের কাছে চিরাচরিত অন্ধ মূল্যবোধের চেয়ে খাদ্যসংস্থান করাই যে এক এবং অদ্বিতীয় কর্তব্য – তা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সুনিপুণ ভাবে এই গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন। সমালোচক আবদুল মান্নান সৈয়দের মতে-

> "মুক্তা ও রামপদর কাহিনী বয়ানই মানিকের একমাত্র উদ্দেশ্য নয় – দুর্ভিক্ষের সম্পূর্ণ ছবি তুলে ধরাই তাঁর লক্ষ্য।"[৫]

দুর্ভিক্ষের রেশ ধরে ১৯৪৪ এ বাংলায় যে বস্ত্র সংকটের ভয়াবহতা দেখা যায় তা ফুটে উঠেছে 'দুঃশাসনীয়' গল্পে। এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী কাপড় গুদাম জাত করে রাখায় গ্রাম বাংলার দরিদ্র মানুষ লজ্জা নিবারণের জন্য পরণের কাপড়টুকুও পায়না। কৃত্রিম ভাবে সৃষ্টি করা এই বস্ত্র সংকটের ফলে সমকালীন গ্রামের দরিদ্র মানুষের জীবন কীভাবে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল তা লেখক এই গল্পে দেখিয়েছেন।

গল্পের প্রেক্ষাপট হাতিপুর গ্রাম। যে গ্রামের মেয়ে, বৌ-রা স্ত্রীলোক সুলভ লজ্জায় সাধারণত দিনের বেলায় ঘরের বাইরে বের হয়না। তারা পালা করে ছায়ামূর্তির মতো বের হয় রাতের অন্ধকারে। কারণ– বাইরে বেরোবার মতো আবরণ তাদের বাড়িতে একখানিই আছে। গ্রামের ভোলা নন্দী, যে –

> "কোমরের ঘুনসির সাথে দু আঙুল চওড়া পট্টি এঁটে তার পাঁচ হাতি ধুতি খানা বাড়ির মেয়েদের দান করেছে। কাপড়খানা যে কোনো সাধারণ গতরের স্ত্রীলোকের কোমরে একপাক ঘুরে বুক ঢেকে কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে – কাঁধে সর্বক্ষণ অবশ্য ধরে রাখতে হয় হাত দিয়ে নইলে বিপদ। ভোলার বউ ঘাটে যায়। ঘাট থেকে ঘুরে এসে ভিজে কাপড়টি খুলে দেয়। ভোলার মেজো ছেলে পটলের বউ পাঁচী বা ভোলার মেয়ে শিউলি কাপড়টি পরে ঘাটে যায়।"[৬]

কেবল ভোলা নন্দীর পরিবারই নয়; বৈকুণ্ঠ, গদাধর, আনোয়ারের মতো গ্রামবাংলার প্রায় সকল পরিবারই এই দুর্ভিক্ষের দিনে বস্ত্রসংকটের শিকার হয়।

আমরা দেখি, গদাধর স্ত্রী ভূতি আর বারো বছরের ছেলে কানুকে রেখে কাজ আর কাপড়ের খোঁজে এগারো দিন আগে গ্রাম ছাড়ে। ক্ষুধায় কাতর কানুর মুখে শিকেয় ঝোলানো পান্তা তুলে দিতে উলঙ্গ ভূতি গায়ে ছেঁড়া মাদুর জড়িয়ে কয়েদ খানা থেকে বেরিয়ে আসে। শিকে থেকে পান্তার হাঁড়িটা নামাতে গিয়ে মাটিতে পড়ে চুরমার হয়ে যায় হাঁড়িটা। এই পরিস্থিতিতে–

> "তখন মাদুরটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে ভূতি এঁটো ভাত আর ভাত ভেজানো এঁটো জলের মধ্যেই ধপ করে বসে দুহাতে মুখ ঢেকে শুরু করে কান্না।"[৭]

অন্যদিকে, আনোয়ারের স্ত্রী রাবেয়া আনোয়ারকে বলে,

> "আজ শেষ। আজ যদি না কাপড় আনবে তো তোমায় আমায় খতম। পুকুরে ডুবব, খোদার কসম।"[৮]

যে রাবেয়া দুর্ভিক্ষের দিনগুলোতে অনাহারে থেকে আনোয়ার কে সাথে নিয়ে বেঁচে থাকবার লড়াই করেছে, আজ সে কাপড়ের জন্য মরণ কামনা করছে। আসলে,

> "খেতে দিতে না পারারা দোষ ও গ্রাহ্য করেনি, পরতে দিতে না পারার দোষ ও সইতে নারাজ।"[৯]

তাই শেষ পর্যন্ত অপমানে, লজ্জায় রাবেয়া আত্মহত্যা করে। কন্ট্রোলের কাপড় কালোবাজারে বিক্রি করে দেওয়া আবদুল আজিজ আর সুরেন ঘোষদের মতো দুঃশাসনরূপী অসাধু ব্যবসায়ীদের প্রতি আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে রাবেয়ার এই নীরব প্রতিবাদে সমকালীন গ্রামবাংলার নগ্ন রূপ ধরা পড়েছে।

দুর্ভিক্ষ জনিত সংকটে সমাজে একদল মানুষের ক্ষুধার তাড়নায় জীবন রক্ষার তাগিদ এবং তার পাশাপাশি অর্থলোলুপ আরেক দল মানুষের মনুষ্যত্বের বিসর্জন 'নমুনা' গল্পের মূল বিষয়বস্তু। দুর্ভিক্ষে শহরে মেয়ের চাহিদা বাড়লে কালো বাজারের টাকায় হঠাৎ বড়লোক হওয়া কালাচাঁদ অর্থ লালসায় অভাবের তাড়নায় থাকা মফস্বল, গ্রামের মেয়েদের দেহ ব্যবসার কাজে লাগায়। তার গাঁয়ের ব্রাহ্মণ কেশব চক্রবর্তী দেশের অন্নসংকটের দিনে কিছু অন্নের আশায় নিজের মেয়ে শৈলকে কালাচাঁদের কাছে বিক্রি করে দেয়। মেয়েকে বিক্রির সময় কেশবের স্তিমিত নিস্তেজ দৃষ্টিতে কোনো সহানুভূতি ছিল না। আসলে দুর্ভিক্ষের দিনে –

> "কেবল কেশবের নয়, এরকম অবস্থা আরো অনেকের হয়েছে। অন্ন নেই কিন্তু অন্ন পাওয়ার একটা উপায় পাওয়া গিয়েছে মেয়ের বিনিময়ে। কয়েক বস্তা অন্ন, মেয়েটির দেহের ওজনের দু-তিনগুণ। সেই সঙ্গে কিছু নগদ টাকাও, যা দিয়ে খান কয়েক বস্ত্র কেনা যেতে পারে।"[১০]

কেশবের আগে তার গাঁয়ের রাখালের বোন আর দীনেশের মেয়েও এইভাবে সমকালের দাবীতে বিক্রি হয়ে গেছে। কিন্তু তারা কেউই কেশবের মতো ভদ্র নয়, জাতে বামুন নয়। তাই কেশব নিজের অবিবাহিত মেয়েকে কালাচাঁদের হাতে তুলে দিতে চায়নি, মানসিক সংস্কারের বশে সে ঘরের কোণে থাকা শিলারূপী নারায়ণকে সাক্ষী রেখে শৈলর সাথে কালাচাঁদের বিয়ে দিয়ে শৈলকে কালাচাঁদের হাতে সমর্পণ করে দেয়। শিলারূপী নারায়ণকে সাক্ষী রেখে করা বিয়েতে ধর্মভীরু কালাচাঁদের চরিত্রে সাময়িকভাবে ঈষৎ পরিবর্তন ঘটে। নিজের বিয়ে করা স্ত্রীকে সে দেহব্যবসার কাজে না নামিয়ে সংসারে দাসী চাকরানী মতো রাখতে চায়। তাই শৈলর ঘরে চালের কালোবাজারী করে বড়লোক হওয়া গজেন ঢুকলে কালাচাঁদের মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে। কিন্তু তা সাময়িক। গজেনের থেকে পাওয়া এক তাড়া নোট তার মধ্যেকার অর্থপিপাসাকে ফের জাগ্রত করে। একদিকে অভাব এবং অপরদিকে অর্থলালসা এই দুয়ের দ্বন্দ্বে শৈলের মতো মেয়েরা সমাজের মূলস্রোত থেকে যেভাবে হারিয়ে যায়, তারই করুণ বাস্তব চিত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নমুনা' গল্পটি।

'গোপাল শাসমল' গল্পটি দুর্ভিক্ষ, মহামারী, কালোবাজারীতে বিধ্বস্ত গ্রামবাংলার আর একটি নিদর্শন। সাতপাকিয়ার গগন শাসমলের ছেলে গোপাল জেল থেকে ছাড়া পেয়ে দেখে তার অনুপস্থিতিতে গোটা গ্রাম প্রায় উজাড় হয়ে গেছে। ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া, প্যাঁচড়ার মতো রোগ আর অন্নসংকট জেলে যাওয়ার আগে দেখা প্রাণবন্ত মানুষগুলিকেও আজ হতাশাগ্রস্ত করে তুলেছে। গল্পের শুরুতে লেখক গোপালের বাড়ির অবস্থা পরিবর্তনের এক সংক্ষিপ্ত বিবরণের মধ্যদিয়ে বিধ্বস্ত গ্রামবাংলার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন -

> "জেলে যাওয়ার আগে তার বাড়িতে ছিল মন পঁচিশেক ধান, দুটো বলদ, একটা গোরু, পুঁইমাচা লাউমাচা আর তিনটে সজনে গাছ। বাড়ি ফিরে দেখল, ধান মোটেই নেই, একটা বলদ নেই, গোরুটা নেই, পুঁই মাচায় নেই পুঁই, আর লাউ মাচায় নেই লাউ।"[১১]

আবার গল্পের শেষে দেখতে পাই ক্ষুধার তাড়নায় থাকা ভূষণের মেয়ে রতন দু-মুঠো অন্নের জন্য কীভাবে দিনের পর দিন জোতদার কানাইয়ের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছে -

> "চাল এনেছ তো? আজ আগে চাল দেবে, তবে ছুঁতে দেব। মাইরি বলছি কানাই বাবু-"[১২]

সমকালীন দুর্ভিক্ষের সময়ে প্রবল অন্নসংকটের পটভূমিতে রচিত 'সাড়ে সাত সের চাল' গল্পটি। দীর্ঘদিন ধরে অভুক্ত থাকা পরিবার পরিজনদের মুখে খাদ্যের জোগান দিতে সন্ন্যাসী গ্রাম ছেড়ে শহরে পাড়ি দেয়। শহর থেকে অনেক কষ্টে সাড়ে সাত সের চাল জোগাড় করে সে অবসন্ন শরীরে আঁধার রাতে স্টেশন থেকে প্রায় সাতমাইল দূরে অবস্থিত নিজের গ্রামের দিকে পায়ে হেঁটে রওনা দেয়। তার অবসন্ন শরীর স্টেশনের শেডটার নীচে বিশ্রাম নিতে চাইলেও তার কল্পনা প্রবণ আশঙ্কিত মন তাকে সেই রাতেই গ্রামের দিকে রওনা দিতে বাধ্য করে। কেননা তার বারবার মনে হয় -

> "না খেতে পেয়ে ক জন তার বাড়িতে ইতিমধ্যে মরে গেছে কে জানে! ক জন মরোমরো হয়ে আছে তাই বা কে জানে! দু-একজন হয়তো ঠিক এমন অবস্থায় পৌঁছেছে – তাদের মধ্যে সোনা বউঠান একজন হতে পারে

> – তার সাড়ে সাত মন চালের দুমুঠো নিয়ে সিদ্ধ করে আজ মাঝ রাতেও দিতে পারলে যারা জীবন মরণের সীমারেখায় টলমল করার বদলে বেঁচে যাওয়ার দিকেই কোনোমতে টলে পড়বে। আবার লড়াই করতে পারবে তারপর। কাল পর্যন্ত দেরি করলে হয়তো -।"[১৩]

স্টেশন থেকে প্রায় মাইল তিনেক হেঁটে প্রথম গ্রাম সালাতিতে আসবার পর সন্ন্যাসী অনুভব করে গ্রামটির নিস্তব্ধতা। এমনকি যে কুকুরগুলো রাতে গ্রামে পাহারা দিত, আজ তারাও অনুপস্থিত। তা দেখে সন্ন্যাসীর মনে স্বজন হারানোর আতঙ্ক প্রবল ভাবে নাড়া দেয়। অবশিষ্ট পথটুকু সে হেঁটে বাড়ির কাছে এসে ছোটো কলাবাগান আর সবজিক্ষেতের লোপ পাওয়া বেড়ার চিহ্ন, অদৃশ্য হওয়া লাউ, কুমড়ার মাচা দেখে খানিক স্বস্তি বোধ করে। কল্পনা প্রবণ সন্ন্যাসী ভাবে -

> "বেড়া আর মাচা নিশ্চয় উনানে পুড়েছে। উনানে আগুন জ্বলছে তার বাড়িতে, রান্না হয়েছে। হয়তো সবাই বেঁচে আছে বাড়িতে, একজনও মরেনি।"[১৪]

বাড়ি পৌঁছে একে একে সে সবাইকে ডাকতে থাকে। কিন্তু কারোর সাড়া নেই। দরজার শিকলে তালা লাগানো। তার অনুপস্থিতিতে বাড়ির সবাই কোথায় চলে গিয়েছে কিংবা পরিবারের কয়জন আর জীবিত আছে – এইসব ভাবতে ভাবতে সন্ন্যাসী দাওয়া থেকে হুমড়ি খেয়ে উঠোনে পড়ে নিঃশব্দে মারা যায়। প্রবল অন্নসংকটের দিনে অভুক্ত পরিবারের মুখে সামান্য কিছু অন্ন তুলে দেওয়ার যে ব্যগ্রতা – তা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সন্ন্যাসী চরিত্র অঙ্কনের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন।

দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে রচিত 'প্রাণ' গল্পটি অভাবের তাড়নায় গ্রাম ছেড়ে শহরে আসা এক সর্বহারা কৃষক পরিবারের গল্প। দুর্ভিক্ষের সময় শহরে সরকার কর্তৃক অল্পবিস্তর সাহায্য মিললেও গ্রামে থেকে মানুষেরা সেই সুবিধাটুকু ভোগ করতে পারত না। তাই দলে দলে গ্রামের বুভুক্ষু মানুষ শহরের রাস্তায় এসে জড়ো হয়। আলোচ্য গল্পের অটল ও তার স্ত্রী মালতী সেই দলেরই পথিক। অন্নের আশায় শহরে এলেও তারা খুব একটা সুবিধে করে উঠতে পারেনি, প্রায়ই উপোস করে তাদের দিন কাটে। এই পরিস্থিতিতে মালতীর ওপর শহরের একবাবুর নজর পড়তেই আগামী দিনগুলিকে সুনিশ্চিত করবার অভিপ্রায়ে অটল তার স্ত্রীকে সেই বাবুর কাছে পাঠাতে চায়। গ্রামের ভীরু, লাজুক বউ মালতী প্রথম দিকে অটলের সেই ইচ্ছাকে আমল না দিলেও শেষ পর্যন্ত সে অটলের জেদের কাছে হার মানে। নির্জন রাতে বাবুর বাড়িতে মালতী একাকী যাবে, এই প্রতিশ্রুতিতে মালতী বাবুর কাছ থেকে কিছু খাদ্যবস্তু সংগ্রহ করে আনে। সংগ্রহ করে আনা খাদ্য খেয়ে সমাজের প্রতি অটলের মনে যে জ্বালা বোধ ছিল তা কমে যায়। তবুও সে পূর্ব পরিকল্পনা মাফিক মালতীকে নিয়ে বাবুর বাগান বাড়িতে যায়। মালতীকে সাথে নিয়ে গভীর রাতে বাবু যখন মদের নেশায় বেঁহুশ হয়ে যাবে, তখন মালতী অটলের জন্য বাড়ির দরজা খুলে দেবে এবং দুজনে মিলে বাবুর সর্বস্ব চুরি করে কোনো দূর দেশে পাড়ি দেবে। কিন্তু বাবু যদি কোনো কারণে বেঁহুশ না হয় তা হলে অটল মালতীকে না জানিয়ে যে লোহার ডান্ডা নিয়ে এসেছে তা দিয়ে বাবুকে মেরে পালাবে।

গল্পের শেষ পর্যায়ে এসে দেখতে পাই, বাবুর কাছে গভীর রাতে একাকী আসবার জন্য মালতী প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেও সে বাবুর বাড়ির বাইরে গাঁদা বাগানেই লুকিয়ে থাকে। ভেতরে যেতে সাহস পায়না এবং শেষ পর্যন্ত অটলের হাত ধরেই সে ফিরে আসে। ক্ষুধার তাড়নায় মানুষের ক্ষতি করবার বাসনা তাদের মধ্যে সাময়িকভাবে জাগ্রত হলেও এ কাজ যে তাদের দ্বারা সম্ভব নয়, তা তারা বুঝতে পারে।তাই অটল বলে –

> "কি জানিস, এ সব মোদের কাজ নয়কো।"[১৫]

আলোচনার একেবারে শেষে এসে বলা যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লেখক হিসেবে ছিলেন বাস্তবমুখী। তাই পঞ্চাশের মন্বন্তরকালীন দুর্ভিক্ষ, মহামারী, কালোবাজারী প্রভৃতি সমস্যার সঙ্গে যুঝতে থাকা মানুষের জীবনযুদ্ধ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর রচনায় প্রত্যক্ষভাবে স্থান পেয়েছে। ফলে সমাজচেতনা, রাজনৈতিক মূল্যবোধ ও মানবতাবোধের আলোকে রচিত তাঁর এই ছোটোগল্পগুলি হয়ে উঠেছে দুর্ভিক্ষ পীড়িত গ্রাম বাংলার বিশ্বস্ত দলিল।

তথ্যসূত্র :

১. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, কালের পুত্তলিকা, দে'জ, কলকাতা, ৪র্থ সংস্করণ, ২০১০, পৃ. ৪৪১
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, রচনা সমগ্র, ৫ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ১৬৭
৩. তদেব, পৃ. ১৭০
৪. তদেব, পৃ. ১৭০
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, শ্রেষ্ঠ গল্প (আবদুল মান্নান সৈয়দ – সম্পাদিত), প্রতীক প্রকাশনা, ঢাকা, আগষ্ট ২০১১, পৃ. ২০
৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, রচনা সমগ্র, ৫ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ১৭৪
৭. তদেব, পৃ. ১৭৫
৮. তদেব, পৃ. ১৭৫
৯. তদেব, পৃ. ১৭৫
১০. তদেব, পৃ. ১৭৯
১১. তদেব, পৃ. ১৮৮
১২. তদেব, পৃ. ১৯০
১৩. তদেব, পৃ. ২৯৮
১৪. তদেব, পৃ. ২৯৯
১৫. তদেব, পৃ. ৩০৭